বড়ো জ্যাঠামশায়

BANGLADARSHAN.COM

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥বড়ো জ্যাঠামশায়॥

ভাই সরলা

‘সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ–
সাগর সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত তপন।
স্বপন-রমণী–আইল অমনি–
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা–করে পদার্পণ!’

বড়ো জ্যাঠামশায়ের ‘স্বপ্ন-প্রয়াণে’র এই কটি ছত্র কবিতা–নয় বৎসর বয়সে আমার কাছে যেমন মনোহারী ছিল আজ পঞ্চান্ন বৎসরেও ঠিক তেমনি রয়েছে। জীবনের প্রাতঃসন্ধ্যায় যে স্বপ্ন-পুরে নিয়ে গিয়েছিল মনকে টেনে এই কবিতা, আজও সায়ংসন্ধ্যায় এই কবিতারই ছন্দ ধরে গিয়ে উপস্থিত হল মন সাগরতীরে স্বপ্ন-পুরের দরজায়। আমার আজ মনে পড়ছে জ্যাঠামশায়ের তেতলার ঘরের সামনের ছাদে দুপুর বেলার রোদ পড়েছে, আমরা ছোটো ছোটো সবাই ছেলে ছাদের পাঁচিল বেয়ে বাড়ির এ-মহল থেকে ও-মহলে খাবার চুরি করতে চলেছি, সেই সময় জানলার ফাঁকে কোনোদিন দেখা যেত জ্যাঠামশায় বই লিখছেন নয়তো–গান রচনা করছেন–কিংবা কালো রঙের একটা বাঁশি বাজাচ্ছেন–তখন মনে হত আমরাও কবে অমনি বড়ো হব, বই লিখব, গান গাইব। সেদিন আবার যখন আমারো চুল পেকেছে, হাতের লেখা রঙিন হয়ে ফুটেছে, সুরে-বেসুরে বাঁশিও বেজে গেছে–সেই আর-এক সন্ধ্যায় বোলপুরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখলেম জ্যাঠামশায় ঠিক সেইভাবে একলা চৌকিতে বসে লিখেছেন আর আমাদেরই মতো গোটাকতক দুষ্ট ছেলে আর দুষ্ট পাখি কাঠবেড়ালী কাক তারা কেউ ঘরের দাওয়ায় কেউ খিড়্কির বাগানে ঘুর-ঘুর করছে! ছোটোতে আর বড়োতে শৈশবে আর বার্ধক্যে এমন সুন্দর মিলন-স্মৃতি বড়ো দুর্লভ, মানিকের মতো আমার বুকের কৌটোতে ধরে দিয়ে গেছেন আমার–জ্যাঠামশায়, সে কৌটা সবার সামনে খুলতে নেই, সব সময়ও খুলতে নেই! যাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আমি আমার নিজের ভাষা খুঁজে পেলেম তাঁকে স্বপ্নলোকের পরপারে গিয়েও মন আমার প্রণতি দিয়ে এল এইমাত্র।

তোমারি অবনদাদা

২

তখনকার দিনে গুরুজনদের ছিলেন তিনি বড়দাদা, পাড়াপড়শী সকলের বড়োবাবু এবং আমাদের জোড়াসাঁকোর ছেলেমেয়েদের তিনি বড়ো জ্যাঠামশায়। তখন নাম ধরে এ-বাবু সে-বাবু ডাকার রীতি ছিল না।

BANGLADARSHAN.COM

সেই আমাদের ছেলেখেলার বয়স। সেকালের তাঁর চেহারা কালো চুল, কালো গোঁফ, ফিট গৌরবর্ণ, দাড়ি নেই, শালের জোব্বা গায়ে—এই মনে আছে।

মাঝে মাঝে বালকদল ও-বাড়ির তেতলায় তাঁর ঘরটায় উঁকি দিতেম—মস্ত একটা অর্গান, একটা ফ্লুটো বাঁশি, লেখার টেবিল, খাতাপত্র। ঘরের একধারে মস্ত একখানা খাট, তার চার খাম্বায় চারটে পরী, ছত্‌রির উপরে একটা পাখি দুই ডানা মেলিয়ে যেন উড়ি উড়ি করছে। খাটখানা রাজকিষ্ট মিস্ত্রি গড়েছিল কর্তাদিদিমার ফরমাস মাফিক। যখন গড়া শেষ হয়েছে তখন কে বললে, 'কর্তামা, চালের উপরে চিল বসিয়েছে যে?' 'চিল কেন, শুকপাখি।' সেই খাট বিয়ের দিনে উপহার বড়ো জ্যাঠামশায় পেয়েছিলেন জানি। অনেকদিন পর্যন্ত খাটখানা ও-বাড়িতেই ছিল—এখন আর দেখতে পাই নে।

বড়োবাবুর হাসি পাড়া-মাতানো। যারা শুনেছে, তারা শুনেছে—হাসি-সমুদ্র যেন তোলপাড় করছে, থামতেই চায় না—

এই সময় 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' লেখা ও শোনানো চলেছে—

করিয়া জয় মহাপ্রলয়, বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা;

তালবেতাল দিতেছে তাল ধেই নাচে পিশাচ দানা।

BANGLADARSHAN.COM

আবার—

গাধায় চড়ি, লাগায় ছড়ি
অদ্ভুত রস কিম্পুরুষ।
দুটি অধরে হাসি না ধরে
লম্বা উদর বেঁটে মানুষ।

এগুলো ছড়ার মতো মুখে মুখে আউড়ে চলেছি। বাংলা ভাষায় এমন স্বচ্ছন্দতা আর-কোনো কবিতায় পাই নে।

বড়ো হয়ে জ্যাঠামশায়ের বক্তৃতা সে আর-এক ব্যাপার। 'আর্যামি ও সাহেবিআনা'র জলদগম্ভীর ধ্বনি ও ভাষার মাধুর্য লোকের মনকে একেবারে দু-তিন ঘণ্টার মতো মুগ্ধ করে রাখত। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত এবং বালকসুলভ সরলতা ও মন-ভোলা অবস্থা বন্ধুজনের কাছে তাঁকে প্রিয়তর করেছিল। তখনকার রীতি বড়োদের কাছে ছেলেদের ঘেঁষা অপরাধ—সুতরাং আমরা নিজেদের বাঁচিয়ে চলতেম।

ছবি আঁকার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। কুমারসম্ভবের ছবি, শকুন্তলার ছবি, সব আর্টিস্টদের দ্বারা আঁকিয়ে আমার পিসিমাদের উপহার দিয়েছিলেন। সেইগুলো তখনকার আর্ট স্টুডিওর নমুনা। বঙ্কিমবাবু সূর্যমুখীর ঘরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে অনেকগুলো সেই ছবির কথা আছে।

কথায় কথায় একদিন বড়ো জ্যাঠামশায় বললেন, 'দেখ, আমি আর্টস্টদের ছবি ফরমাস দিলেম কুমারসম্ভব থেকে বেছে বেছে, তারা যখন এঁকে আনলে, দেখি 'ইয়ে' করতে 'ইয়ে' ক'রে এনেছে।' বলেই অট্টহাস্য! খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি মেঘদূতের যে ছবি এঁকেছ তা দেখেছি, ইউরোপীয়ান আর্টিস্টদের মাস্টারপিস্ আঁকতে পারো তো বুঝি!'

প্রবাসীতে 'চিত্রষড়ঙ্গ' লিখছি, জ্যাঠামশায়ের কেমন লাগে জানবার ইচ্ছে হল। খাতা উলটে-পালটে দেখে বললেন, 'সাধারণ লোক ভালোই বলবে, কিন্তু পণ্ডিতের হাতে পড়লেই গেছ।' বলেই অট্টহাস্য।

বয়সের পারে প্রায় এখন পৌঁচেছি। অনেক সেকালের কথা মনে আসে, মুখে মুখে অনেক কথা শোনাতে পারি—লিখতে গেলে সব কথা কলমে সরতে চায় না।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥